৭১ কথা

৭১ কথা ২

৭১ কথা ৩

৭১ কথা ৪

৭১ কথা ৫

৭১ কথা ৬

৭১ কথা ৭

৭১ কথা ৮

৭১ কথা ৯

৭১ কথা ১০

৭১ কথা ১১

৭১ কথা ১২

৭১ কথা ১৩

৭১ কথা ১৪

৭১ কথা ১৫

৭১ কথা ১৬

৭১ কথা

মানিক মোহাম্মদ রাজ্জাক

অনলাইনে অর্ডার করতে
http://nalonda.com.bd

কলকাতায় পরিবেশক
বইবাংলা
স্টল ১৭, ব্লক ২, সূর্য সেন স্ট্রিট
কলেজ স্কোয়ার দক্ষিণ, কলকাতা ৭০০০১২
ফোন : +৯১৭৯০৮০৭১৭৬৫ (কলকাতা)

'৭১ কথা	মানিক মোহাম্মদ রাজ্জাক
প্রকাশক	রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল নালন্দা ৩৮/৪ বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট) তৃতীয় তলা, ঢাকা ১১০০
স্বত্ব	পৌষী রাজকন্যা
প্রচ্ছদ	আইউব আল আমিন
প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ২০২৪
মুদ্রণ	শামীম প্রিন্টিং প্রেস
বর্ণবিন্যাস	নালন্দা কম্পিউটার বিভাগ
মূল্য	৫৫০.০০ টাকা
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক	মুক্তধারা জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক
©	Poushi Razkonna
71 Kotha *(People's Experience of Libaration Era By)*	Manik Mohammad Razzak
Cover Design	Ayub Al Amin
First Pubished	February 2024
Publisher	Redwanur Rahman Jewel Nalonda 38/4 Banglabazar (Mannan Market) 2nd Floor, Dhaka 1100
Price	550.00 Tk only
ISBN	978-984-97773-5-9
E-mail	nalonda71 @gmail.com

উৎসর্গ

স্বাধীনতা যুদ্ধকালে অনেকে বাবা, মা, সন্তান বা স্বজনদের হারিয়েছেন, স্বজন হারানো সেইসব আত্মত্যাগীদের স্বীকৃতির জন্য যাঁরা আজও পতাকার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন তাঁদের শ্রদ্ধার্থে এ ক্ষুদ্র প্রয়াস

প্রাক্‌কথন

ধর্মগত মিল ব্যতিরেকে কোনোদিক দিয়েই তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানিদের সাথে বাঙালিদের মিল ছিল না। তদুপরি দুইশত বছরের ব্রিটিশীয় শোষণে জর্জরিত পূর্ব বাঙলার ...

সংখ্যাগরিষ্ঠ (মুসলিম) জনগোষ্ঠী মনে করেছিল; ব্রিটিশদের বিতাড়নের সাথে সাথে যদি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো নিয়ন্ত্রণকারী হিন্দু জমিদার, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য পেশাজীবীদের প্রভুত্ব থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারে, তাহলে তারা হয়তো একটি শোষণহীন-ন্যায়সঙ্গত সমাজজীবনের নাগাল পাবে। তৎকালীন বাস্তবতায় তাদের এহেন ভাবনা খুব একটা অসংগতও ছিল না। যে কারণে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তারা চন্দ্রতারকা খচিত পতাকার তলে নিজেদের সমর্পন করেছিল। আখেরে তারা প্রতারিত হয়েছে। পাকিস্তান তাদের জন্য কোনো সুফলই বয়ে আনেনি। শোষণের চাকা পুরোনো বৃত্তেই আবর্তিত হয়েছে। শুধু পুরোনো শোষকের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে নয়া শোষকেরা। সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও বাঙালিরা কখনো শাসন কাঠামোতে স্থান পায়নি। নানামুখী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাদেরকে দূরে রাখা হয়েছে। বাঙালিদের শিল্প, সংস্কৃতি ও ভাষাও কখনো তাদের দ্বারা সমাদৃত হয়নি। অধিকন্তু জাতিগতভাবে প্রতিনিয়ত হতে হয়েছে নিগৃহীত। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের শিকার হয়ে পদে পদে হতে হয়েছে লাঞ্ছিত, নির্যাতিত ও অপমানিত। পাকিস্তানি শাসকরা শাসনের নামে প্রকারান্তরে বাঙালি জাতিকে শোষণ করার অপতৎপরতায় লিপ্ত হয়েছিল। পূর্বাঞ্চলকে বানিয়েছিল তাদের উপনিবেশ। এহেন অনাচারিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অনতিকাল পরেই বাঙালিরা সোচ্চার হয়েছিল। এর বহিঃপ্রকাশ দেখা গিয়েছিল ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনকালে। সেই নির্বাচনে পূর্ব বাংলার মাটি থেকে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে সমূলে উৎপাদন করেছিল (ওই নির্বাচনে মোট আসন ছিল ৩০৯ টি, এর মধ্যে মুসলিম আসন ছিল ২৩৭টি। যার মাত্র ৯ টিতে জয়ী হয়েছিল মুসলিম লীগ) বিক্ষুব্ধ জনগোষ্ঠী। অতঃপর শোষণীয় অপকর্ম অব্যাহত রাখার নিমিত্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দাফন করে দেশটিতে জারি করা হয়েছিল সামরিক শাসন। এরই এক পর্যায়ে আঞ্চলিক শোষণ নিরোধ ও শাসন কাঠামোতে বাঙালিদের যৌক্তিক অংশীদারিত্বের দাবিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ছয়দফা উত্থাপিত হলে; বিচলিত হয়ে পড়ে শাসকগোষ্ঠী। শুরু হয় নয়া আঙ্গিকের জেল, জুলুম ও নানামুখী অবদনমূলক নির্যাতন। বহুল আলোড়িত ছয়দফার ম্যান্ডেট হিসেবে পরবর্তী সময়ে-১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালিরা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলে; বিচলিত পাকিস্তানিরা ক্ষমতা তথা শোষণিক সুবিধা হতে বিচ্যুতির

ভয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। একপর্যায়ে কালো আদমিদের ক্ষমতায়ন রোখার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। এরই ধারাবাহিকতায় পুরো জাতিকে আদিম কায়দায় অবদমিত করার এক অপমানসিকতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরস্ত্র জাতির ওপর। শত বছরের শৃঙ্খলে আবদ্ধকরণের অভিসন্ধি নিয়ে আটক করা হয় এ জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। অপারেশন সার্চলাইটের নামে রাতের অন্ধকারে ট্যাঙ্ক, কামান ও বিভিন্ন মারণাস্ত্র নিয়ে নেমে পড়ে তারা জাতিগত নিধনযজ্ঞে।

হত্যাযজ্ঞের সাথে চালাতে থাকে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ। পুড়িয়ে দেওয়া হয় গ্রামের পর গ্রাম। নারীদের উপর চালানো হয় পাশবিক অত্যাচার। এ ধরনের হত্যা, ধ্বংস ও ধর্ষণযজ্ঞ হতে নিষ্কৃতির জন্য ৯৮ লক্ষ বাঙালি সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে শরণার্থী হিসেবে পার্শ্ববর্তী দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এছাড়াও লক্ষ লক্ষ পরিবারকে ঘরবাড়ি ফেলে উদ্বাস্তুর মতো পালিয়ে থাকতে হয় দেশের অভ্যন্তরে–প্রত্যন্ত অঞ্চলে। পুরো দেশটিকে পরিণত করা হয় ভীতিপ্রদ সন্ত্রস্ত এক জনপদে। একই পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণা মোতাবেক স্বাধীনতাসংগ্রাম সূচিত হলে; চারদিকে শুরু হয় প্রতিরোধ যুদ্ধ। দেশকে দখলদার মুক্ত করার প্রত্যয়ে মুক্তিসেনারা হতে থাকেন শত্রুর মুখোমুখি। অজস্র মৃত্যুর মধ্য দিয়ে চলতে থাকে দেশকে শত্রু মুক্ত করার সশস্ত্র সংগ্রাম। এ সময় (মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস) হানাদার-বাহিনীর গণহত্যাসহ নানারৈখিক ধ্বংসযজ্ঞ কবলিত এই জনপদকে পরিণত করা হয় এক মৃত্যু উপত্যকায়। প্রকাশ থাকে যে; যে কোনো যুদ্ধ অথবা আগ্রাসন কখনো শুধু গোলাগুলির পরিধিতে সীমাবদ্ধ থাকে না। এর পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে জনপদের সার্বিক পরিবেশ। খাদ্য সংকট, আবাসন সংকট, নিরাপত্তা সংকট ও চিকিৎসা সংকটসহ উদ্ভূত হয় মানবেতর জীবনের নানা অনুষঙ্গ। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধকালও এর ব্যতিক্রম ছিল না। এহেন পরিস্থিতিতে যারা দেশে অবস্থান করছিলেন তাদেরকে প্রতিনিয়ত হতে হয়েছিল মৃত্যুর মুখোমুখি। যারা অশ্রিত হন ভারতের শরণার্থী শিবিরে, তাদেরকে নিপতিত হতে হয় মানবেতর জীবনের গহ্বরে। পলায়ন পথের পদে পদে হতে হয় বিপর্যস্ত। জাতির ক্রান্তিকালের সেসব অভিজ্ঞতাই স্মৃতিকথা আকারে এ গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে। এঁদের অনেকে দেখেছেন হানাদার-বাহিনীর গণহত্যাসহ নানামাত্রিক ধ্বংসযজ্ঞ, দেখেছেন সংকটকাল, দেখেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব, দেখেছেন হানাদার-বাহিনীর বিপর্যয়, তাদের দোসর- দালাল-রাজাকারদের পাপের পরিণতি। কেউ কেউ প্রত্যক্ষ করেছেন পিতাসহ স্বজনদের হত্যাযজ্ঞ। মোট ২১ জনের স্মৃতিচারণা এ গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিটি লেখনীর সাথে তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরচিতি দেওয়া হয়েছে। প্রকাশ থাকে দুজন ব্যতিরেকে স্মৃতিচারণকারীদের সকলেই সেসময় ছিলেন বালক বা কিশোর। সেইসময়কার ছোট চোখে তাঁরা যা দেখেছিলেন, যেসব

বিরূপতার মুখোমুখি হয়েছিলেন, যেসব সংকটে নিপতিত হয়েছিলেন; সেসবের নিরিখেই স্মৃতিচারণা করেছেন।

এক্ষেত্রে কামারখালি উচ্চ বিদ্যালয়ের তৎকালীন নবম শ্রেণির ছাত্র প্রফেসর ড. ওয়াহিদুজ্জামান (প্রফেসর ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান, সাবেক মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা)। স্মৃতিচারণকালে তাদের এলাকায় (মধুখালী উপজেলা) সংঘটিত হানাদারসেনা ও রাজাকারদের হত্যাযজ্ঞ, ধ্বংসযজ্ঞ, লুটতরাজ ও অগ্নিসন্ত্রাস প্রসঙ্গে যেমন আলোকপাত করেছেন, তেমনি এলাকার মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ লড়াই ও মিত্রবাহিনীর অগ্রাভিযান সম্পর্কেও করেছেন প্রাসঙ্গিক আলোকপাত। বাবুল আখতার ছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অত্যন্ত পরিচিত একজন। নিয়মিত সংবাদ পাঠ করতেন। তাঁর বিষয়ে লিখেছেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন। কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাস্থ ঘাগরা গ্রামের আবুল হোসেনের বাবা ছিলেন নৌকা মার্কা তথা আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থক। হানাদাররা গ্রামটিতে আগ্রাসনকালে তাঁর উপস্থিতিতে তাঁর বাবাকে গুলি করে হত্যা করেছিল। স্মৃতিচারণায় (সাক্ষাৎকার) তিনি হানাদার, রাজাকার ও স্থানীয় দালালদের নানাবিধ অনাচার ও করুণ পরিণতির বিষয়াদি তুলে ধরেছেন।

আলাউদ্দিন আল আজাদের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলায়। ১৯৭১ সালে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়তেন। প্রত্যক্ষ না করলেও অনুভব করেছেন এলাকার গণহত্যার উত্তাপ। প্রত্যক্ষ করেছেন পিতার মৃত্যু যিনি পরিচিত লোকজনের হত্যাযজ্ঞের ধকল সইতে না পেরে শোকাতুর হয়ে ম্যাসিভ হার্ট এটাকে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। মো. আলাউল হক (ডিউ) ১৯৭১ সালে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়তেন। ভারতে না গেলেও দেশের অভ্যন্তরে পার করেছেন শরণার্থী জীবন। সংকটাপন্ন পরিস্থিতিসহ প্রত্যক্ষ করেছেন মুক্তিযুদ্ধ সম্পৃক্ত বিবিধ অনুষঙ্গ।

কবি ও লেখক কামরুজ্জামান ভূঁইয়া বাস করতেন তখনকার চাঁদপুর মহকুমাস্থ ফরিদগঞ্জ থানার রূপসা গ্রামে। বড়ভাই খালেকুজ্জামান ভূঁইয়া মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডারের দায়িত্বে থাকায় তাঁদের গ্রামের বাড়িতে থাকা অনিরাপদ হয়ে ওঠে। ফলে অনেকটা বাধ্য হয়ে তাকে ঢাকায় আত্মীয়ের বাড়িতে এসে থাকতে হয়। মুক্তিযুদ্ধ সম্পৃক্ত সেই পলাতক জীবনের বিবিধ বিষয় তুলে ধরেছেন স্মৃতিচারণায়। খায়রুল বশীর-রতন পড়তেন সেন্ট্রাল গভ: বয়েজ হাই স্কুলে-নবম শ্রেণিতে। থাকতেন শাহজাহানপুর রেলওয়ে কলোনিতে। ২৫ মার্চের পর গ্রামের বাড়ি বেরাইদে চলে যান। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রত্যক্ষ করেছেন রাজারবাগ পুলিশ লাইনের আগ্রাসনসহ এলাকার গণহত্যা, আগুনসন্ত্রাস ও মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ লড়াই। পার করেছেন অনিশ্চিত উদ্বাস্তু জীবন। ড. গোপাল কৃষ্ণ বোস বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায়

বসবাস করছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে ছিলেন এসএসসি পরীক্ষার্থী। ইচ্ছে সত্ত্বেও যোগ্যতার ঘাটতির কারণে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে পারেননি। প্রত্যক্ষ করেছেন রাজাকার ও হানাদার সেনাদের সৃষ্ট মানবিক বিপর্যয়ের বিবিধ দিক। স্বাধীনতার পরপর প্রত্যক্ষ করেছেন স্বাধীনতা বিরোধী দালালদের করুণ পরিণতি। স্বাধীনতা যুদ্ধকালের সেসব বিষয় স্মৃতিচারণায় তুলে ধরেছেন। একাধিক গ্রন্থের প্রণেতা ড. গোলাম শফিক-এনডিসি একজন লেখক, কবি ও নাট্যকার, সাবেক অতিরিক্ত সচিব। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে পড়তেন ষষ্ঠ শ্রেণিতে। থাকতেন বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার সরার চরে। প্রত্যক্ষ করেছেন রাজাকার ও হানাদার সেনাদের গণহত্যা, লুটতরাজ ও ধ্বংসযজ্ঞ। দেখেছেন স্থানীয় দালালদের দম্ভ ও বিপর্যয়। যা তুলে ধরেছেন স্মৃতিকথায়। মুক্তিযুদ্ধ গবেষক নাজমুল আহসান শেখ ১৯৭১ সালে ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়তেন। থাকতেন সাইন্স ল্যাবরেটরি স্টাফ কোয়ার্টারে। প্রত্যক্ষ করেছেন গণহত্যার সূচনাকালের ভয়াবহতা। নিরাপত্তার তালাশে উত্তাল পদ্মা পারি দিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন প্রত্যন্ত গ্রামে। দেখেছেন শরণার্থী সময়ের বিবিধ সংকট। লেখক-গবেষক প্রবীর বিকাশ সরকার স্বাধীনতা যুদ্ধকালে পরিবারের সাথে বাস করতেন কুমিল্লা শহরে। স্বাধীনতা যুদ্ধের নয়মাস অবরুদ্ধ অবস্থায় দেখেছেন স্থানীয় রাজাকার ও হানাদারদের নানামুখী আগ্রাসন, মানবিকতার বিপর্যয়। পার করেছেন এক সন্ত্রস্ত অনিশ্চিত সময়।

তৎকালীন ফরিদপুর জেলার সদর মহকুমাধীন কানাইপুরের সন্তান সাংবাদিক-সম্পাদক প্রবীর সিকদার প্রত্যক্ষ করেছেন হানাদার, স্থানীয় রাজাকার, শান্তি কমিটির দালাল ও বিহারিদের গণহত্যা, লুটতরাজ ও নানাবিধ ধ্বংসযজ্ঞ। সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছেন পিতা, কাকা ও স্বজনদের নির্মম হত্যাযজ্ঞ। দেখেছেন এলাকার পরিচিত ঘাতকদের বীভৎস বর্বরতার স্বরূপ। মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় মো. বসির উদ্দিন (বিভাগীয় পরিচালক-পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর) ৫ম শ্রেণিতে পড়তেন। থাকতেন কিশোরগঞ্জ মহকুমার কালিকা প্রসাদে। স্বাধীনতার নয়মাসে প্রত্যক্ষ করেছেন এলাকার রাজাকারদের বীভৎস নির্যাতন, হত্যাযজ্ঞ, লুটতরাজ ও অগ্নিসন্ত্রাস। দেখেছেন স্থানীয় দালাল ও রাজাকারদের করুণ পরিনতি। বাবলু কুমার সাহা (অতিরিক্ত সচিব-অব.) পাবনা জেলাধীন বেড়া উপজেলার হরিনাথপুর (নগরবাড়ি) গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে পড়তেন প্রাইমারি পর্যায়ে। প্রত্যক্ষ করেছেন হানাদার সেনা, রাজাকার ও দালালদের লুটতরাজসহ ধ্বংস ও হত্যাযজ্ঞের ভয়াবহতা। একপর্যায়ে প্রাণ বাঁচাতে কণ্টকিত পথ পারি দিয়ে ভারতে চলে যান। মরিয়ম মুর্তজা শেফালী বাস করতেন ফরিদপুর শহরের ঝিলটুলীতে। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে সদ্যপ্রসূত সন্তান নিয়ে পার করেন এক অনিশ্চিত ক্রান্তিকাল। তাঁর প্রত্যক্ষণে উঠে এসেছে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন

সন্ত্রস্ত সময়ের নানারৈখিক অনুষঙ্গ। মানিক মোহাম্মদ রাজ্জাক স্বাধীনতা যুদ্ধকালে প্রত্যক্ষ করেছেন নানারৈখিক মানবতা বিরোধী অনাচার। দেখেছেন ধর্মান্তরসহ হত্যা ও পাশবিকতা। সে নিরিখে তার গল্পে তুলে ধরেছেন একটি নিপীড়িত হিন্দু পরিবারের বিপর্যস্ততার বিবিধ অনুষঙ্গ। মায়া রায়ের আদিবাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায়। বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকের মধ্যভাগে তাঁদের পরিবার এদেশের পাট চুকিয়ে চলে যান পার্শ্ববর্তী ভারতীয় রাজ্য-ত্রিপুরায়। ১৯৭১ সালে; মার্চ মাসের উত্তাল দিনগুলোতে অবস্থান করছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়-আত্মীয়ের বাড়িতে। সেই সুবাদে প্রত্যক্ষ করেছেন সেই সময়কার আন্দোলন-সংগ্রামের নানাবিধ অনুষঙ্গ। এছাড়া প্রত্যক্ষ করেছেন ত্রিপুরায় আশ্রিত শরণার্থী জীবনের নানা দিক। শহিদ পরিবারের সন্তান মাহবুব উজ জামান বাংলাদেশ সরকারের একজন সাবেক রাষ্ট্রদূত ও সচিব। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে বাবাকে হারিয়েছেন। বাবা ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সক্রিয় এক কর্মকর্তা। হনাদার সেনারা তাঁকে বাড়ি থেকে তুলে নেওয়ার পর তাঁর আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। পিতার সাথে শেষ দেখার স্মৃতি আজও তাঁকে তাড়িত করে। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে কবি, কথাশিল্পী ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক মুজতবা আহমেদ মুরশেদ পড়তেন ষষ্ঠ শ্রেণিতে। থাকতেন দিনাজপুর শহরে। বাবা অ্যাডভোকেট মো. আজিজুর রহমান ছিলেন বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি, ১৯৭০-এ নির্বাচিত এমএনএ (মেম্বার অব ন্যাশনাল এসেম্বলি) এবং দিনাজপুর জেলা সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক। যুদ্ধকালে তিনি লে. জেনারেলের পদমর্যাদায় ৭ নম্বর সেক্টর ও ৬ নম্বর সেক্টরের (অর্ধেক) সিভিল অ্যাফেয়ার্স এডভাইজার, ফ্রিডম ফাইটার্স রিক্রুটিং ও লিয়াজোঁ অফিসার এবং একইসাথে প্রবাসী সরকারে পশ্চিমাঞ্চল প্রশাসনিক 'ক' জোনের প্রধান প্রশাসকের দায়িত্বে ছিলেন। পিতার রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে মুরশেদ প্রত্যক্ষ করেছেন স্বাধীনতাযুদ্ধের নানাবিধ অনুষঙ্গ। নিজেরাও পার করেছেন সংকটাকীর্ণ শরণার্থী জীবন। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে রেবা (দত্ত) চৌধুরী মোহরা ছায়েরা খাতুন কাদেরিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। থাকতেন কালুরঘাটে। পৈতৃক বাড়ি চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলায়। প্রত্যক্ষ করেছেন এলাকার গণহত্যা, লুটতরাজ ও ধ্বংসযজ্ঞ। এক পর্যায়ে প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে যান ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে। সেখানে প্রত্যক্ষ করেন শরণার্থী জীবনের অসহায়ত্বের বিবিধ অনুষঙ্গ। হোসনে আরা একজন কবি ও লেখক। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়তেন। গ্রামে নানার বাড়িতে অবস্থানকালে প্রত্যক্ষ করেছেন মুক্তিযুদ্ধসহ গণহত্যার নানাবিধ দিক। এসবের নিরিখেই কথা বলেছেন-লিখেছেন স্মৃতিচারণকারীগণ। যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অনবদ্য উপাদান হিসাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এসকল স্মৃতিচারণায় যে যার মতো করে লিখেছেন। এক্ষেত্রে তথ্যগত

বিভ্রান্তির তেমন সুযোগ নেই। তদুপরি স্বাধীনতার ৫২ বছর পর সে সময়কার স্মৃতিচারণায় ভুল-ত্রুটি থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। যা ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখার অনুরোধ রইল।

আমার অনুরোধে সাড়া দিয়ে যাঁরা শত ব্যস্ততার মধ্যেও মুক্তিযুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন-লিখেছেন, তাঁদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক এ ধরনের স্মৃতিকথা লিখা বা বলার জন্য অনেকের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। অনেকে লিখতে চেয়েও নানাবিধ অসুবিধার কারণে লিখতে পারেননি। অনেকে অসঙ্গতিপূর্ণ তথ্য দেওয়ায় তাদের লেখা পরিহার করতে হয়েছে। মুখ্যত এই গ্রন্থের মাধ্যমে স্বাধীনতা যুদ্ধকালের বিপর্যয়কর পরিস্থিতির বাস্তবতা তুলে ধরতে চেয়েছি। সে সময় এ জাতির একটি প্রজন্মকে কীভাবে বেঁচে থাকতে হয়েছিল, কতটা প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবেলা করতে হয়েছিল, কতটা সংকটাপন্ন অনিশ্চিত সন্ত্রস্ত প্রহর পার করতে হয়েছিল, একটি স্বাধীন জাতির জন্মলগ্নের প্রসব বেদনার কতটা উত্তাপ সইতে হয়েছিল; সে সম্পর্কে নবপ্রজন্মকে অবহিতকরণের তাগিদ থেকেই মুখ্যত এ প্রয়াস। ইতোপূর্বে ২০১৭ সালে 'কথা ৭১' নামে এ ধরনের একটি গ্রন্থ 'কথাপ্রকাশ' হতে প্রকাশ হয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় পর্ব হিসেবে '৭১ কথা' শিরোনামে এ গ্রন্থটি প্রকাশের উদ্যোগে নেওয়া হয়েছে। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ করেছেন আইউব আল আমিন, 'নালন্দা প্রকাশনী'র স্বত্বাধিকারী জনাব রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন, তাঁদের উভয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা রইল।

মানিক মোহাম্মদ রাজ্জাক
১৫ জানুয়ারি, ২০২৪
শহিদ বুদ্ধিজীবী মুনীর চৌধুরী সড়ক, ঢাকা।
marazzaque85@gmail.com

সূচিপত্র

দেখেছি ৭১-প্রফেসর ড. ওয়াহিদুজ্জামান ১৫ বাবুল আখতার : সময়ের কণ্ঠস্বর– অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন ২৮ দেখেছি পিতৃহত্যা–আবুল হোসেন ৩১ একাত্তর ও আমার বাবা– আলাউদ্দিন আল আজাদ ৪০ আমার দেখা ৭১-এর নয়মাস– মো. আলাউল হক ডিউ ৪৭ ৭১-এর পলাতক প্রহর– কামরুজ্জামান ভূঁইয়া ৫৬ দেখেছি গণহত্যা ও বিজয়– খায়রুল বশীর-রতন ৬৭ যুদ্ধকালের স্মৃতিকথা– ড. গোপাল কৃষ্ণ বোস ৮৯ বেদনার মহাকাব্যিক ৭১– গোলাম শফিক ৯৭ দুঃস্বপ্নের অনন্ত প্রহর ৭১– নাজমুল আহসান শেখ ১০৭ ৭১-এর অবরুদ্ধ জীবন– প্রবীর বিকাশ সরকার ১১৫ আমার দেখা কানাইপুরের-গণহত্যা– প্রবীর সিকদার ১৩০ ৭১ কথা– মো. বসির উদ্দিন ১৩৯ বালক বেলার ৭১– বাবলু কুমার সাহা ১৪৭ ৭১: ক্রান্তিকালীন স্মৃতিকথা– মরিয়ম মুরতাজা শেফালী ১৬১ রামদাসের স্বাধীনতা– মানিক মোহাম্মদ রাজ্জাক ১৭৮ বাংলাদেশের স্বাধীনতা-আমার স্মৃতিকথা–মায়া রায় ১৯৮ আমার শহিদ বাবা– মাহবুব উজ জামান ২০৭ ৭১-এর শঙ্কা-শরণার্থী সময়– মুজতবা আহমেদ মুরশেদ ২১৪ ৭১-এর শরণার্থী সময়– রেবা (দত্ত) চৌধুরী ২৩১ দেখেছি মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যা– হোসনে আরা ২৩৭

দেখেছি ৭১

প্রফেসর ড. ওয়াহিদুজ্জামান

স্বাধীনতা যুদ্ধকালে ড. ওয়াহিদুজ্জামান বর্তমান মধুখালী উপজেলার কামারখালি উচ্চ বিদ্যালয়ে-নবম শ্রেণিতে পড়তেন। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে প্রত্যক্ষ করেছেন পাক হানাদার-বাহিনীর নানামাত্রিক হত্যাযজ্ঞ, নৃশংসতা ও ধ্বংসযজ্ঞ। দেখেছেন এলাকার দালাল ও রাজাকারদের নানামাত্রিক অনাচার। প্রত্যক্ষ করেছেন মিত্রবাহিনী ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের দুঃসাহসিক লড়াই। মহান মুক্তিযুদ্ধকালের এসব স্মৃতিচারণা তাঁরই ভাষ্যে এখানে তুলে ধরা হলো; ছয়দফার আন্দোলনে সারাদেশ উত্তাল। একইসাথে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল জেনারেল আইয়ুব খান এবং পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মেনায়েম খানের পদত্যাগ ও আগরতলা মামলায় কারাবন্দি বাংলার অবিসংবাদিত নেতা-শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবিতে সারা দেশের আপামর জনসাধারণ সোচ্চার। মিছিল-সমাবেশে ধ্বনিত হতে থাকে; 'আইয়ুব-মোনায়েম দুইভাই-এক দড়িতে ফাঁসি চাই। জেলের তালা ভাঙ্গব-শেখ মুজিবকে আনব।' এরই মধ্যে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা সেনানিবাসে বন্দি সার্জেন্ট জহুরুল হক এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শামসুজ্জোহা পাকিস্তানি আর্মির গুলিতে শহিদ হলে; সারা দেশের পরিস্থিতি অগ্নিমুখর হয়ে পড়ে। সারা দেশ হয়ে পড়ে প্রতিবাদে উত্তাল। দেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আহূত হয় সাধারণ ধর্মঘট। পুরো দেশ হয়ে পড়ে অচল। এ সময় ফরিদপুর হতে কয়েকজন কলেজ ছাত্র হাজির হন আমাদের স্কুলে। ছাত্রদের আহ্বান জানান-প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দিতে। ধর্মঘটে সহযোগিতার জন্য স্যারদের অনুরোধ করেন। এ পরিস্থিতিতে স্যাররা কী করবেন, তা নিয়ে বেশ দোটানায় পড়ে যান। হেডস্যারসহ কয়েকজন শিক্ষক আমতা আমতা করতে থাকেন। তাঁরা যেমন না করতে পারছিলেন না, তেমনি আবার চাকুরি হারাবার ভয়ে হ্যাঁ-ও বলতে পারছিলেন না। এই অবসরে আমরা ছাত্ররা দল বেধে শ্রেণিকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসি। পথে নেমে স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে যেতে থাকি সড়ক ধরে। এদিন থেকেই শুরু হয়েছিল আমাদের স্কুলের ছাত্রদের মিছিল মিটিংয়ে অংশগ্রহণ। এরপর থেকে হেড স্যার প্রায়শ বলতেন; বুড়োদের দিয়ে কোনো কাজ হবে না, তাঁদের পিছুটান আছে, ঘর-সংসার আছে। ছাত্র-যুবকরাই পারবে দাবি আদায় করতে। ছাত্র সমাজ যেহেতু মাঠে নেমেছে, এবার নিশ্চয়ই কিছু একটা হবে। স্যার নিশ্চয় ছয়দফার সমর্থক ছিলেন, তা না হলে এভাবে ভাবতেন না, বলতেন না। বস্তুত বেঁচে থাকার জন্য তথা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণের করালগ্রাস থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সেসময় হাতে গোনা দু-চারজন মুসলিম লীগার ও জামাতি সমর্থক ছাড়া অধিকাংশ বাঙালিই ছিলেন ছয়দফার সমর্থক। এর পরপরই জেনারেল আইয়ুব

খানকে গদি ছাড়তে হয়। শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেওয়া হয়। অতঃপর দেখতে দেখতে চলে আসে সাধারণ নির্বাচন। জমে ওঠে নির্বাচনি প্রচারণা। আমরা সেসময় ভোটার ছিলাম না। তারপরও মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলাম, পিডিপি ইত্যাকার দলের প্রার্থী বা প্রচারকরা আমাদের এলাকায় এলে; তাদেরকে দেখার সাথে সাথে আমরা তাদের বিপক্ষে ও নৌকার পক্ষে স্লোগান দেওয়া শুরু করতাম। এ ধরনের কাজ আমাদের নিত্যকার অভ্যাসে পরিণত

প্রফেসর ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান

হয়েছিল। এজন্য আমাদের অভিভাবকদের নানা কথা শুনতে হতো। অনেক সময় তাঁরা এমনটা করতে নিষেধও করতেন। কিন্তু কে শোনে-কার কথা। নৌকার পক্ষের প্রচারণাই তখন কৃতিত্ব ও গৌরবের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নির্বাচনি ফলাফলে দেখা যায়; আমাদের এলাকার নৌকা মার্কার এমসিএ (মেম্বার অব কনস্টিটিউশনাল এসেমব্লি) ব্যারিস্টার সৈয়দ কামরুল ইসলাম মোহাম্মদ সালেহউদ্দিন ও এমপিএ (মেম্বার অব প্রোভিন্সিয়াল এসেমব্লি) গৌরচন্দ্র বালা-প্রার্থীদ্বয় বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছেন। নির্বাচনের কিছুদিন পর থেকে আবার বেসামাল হয়ে পড়ে সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি। কেন্দ্রীয় আইনপরিষদের অধিবেশন আহ্বানকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপি দেখা দেয় অচলাবস্থা। এসব বিষয়ে তখন কিছু না বুঝলেও দেশ যে আবার অস্থিরতার দিকে ধাবিত হচ্ছে; তা নানাধর্মী রাজনৈতিক তৎপরতার সুবাদে টের পেতাম। পরবর্তী পর্যায়ে ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অপারেশন সার্চ লাইটের মাধ্যমে গণহত্যা সূচিত হলে; সারা দেশের মতো আমাদের এলাকাতেও পরিস্থিতি অগ্নিমুখর হয়ে ওঠে। দেখা দেয় অচলাবস্থা। একই পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষিত হলে দিকে দিকে শুরু হয় প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রস্তুতি। বন্ধ হয়ে যায় এলাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

স্কুল-কলেজ সব বন্ধ। কোনো কাজ নাই। খেলাধুলা আর ঘুরে বেড়ানো ছাড়া কিছু করার নাই। এসময় আমরা প্রতিদিন স্পোর্টস টিচারের কাছ থেকে ফুটবল নিয়ে স্কুলের মাঠে খেলতাম। এ পর্যায়ে এক বিকেলে খেলার মাঠে খেলতে এসে দেখি ফুটবল নাই। ক্রীড়া শিক্ষকের সাথে দেখা করলে-তিনি সাফ জানিয়ে দেন; স্কুল বন্ধ তাই কোনো বল দেওয়া যাবে না। কথাতো যুক্তিযুক্ত কিন্তু খেলা বন্ধ থাকলেতো চলবে না, বিকেল বেলা না খেললে কী করব আমরা? ফুটবল জোগাড় করাও সহজ না, সে সময় একটা ফুটবলের দাম